ছোটদের
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

মকবুলা মনজুর

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটদের

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

মকবুলা মনজুর

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটদের মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
মকবুলা মনজুর

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭৬৭
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২৩.৬৫৪৯২
ISBN : 984—06—0153—9

প্রথম সংস্করণ

জুন ১৯৯৩
আষাঢ় ১৪০০
যিলহজ্জ ১৪১৩

প্রকাশনায় ঃ

এম. আতাউর রহমান
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ

মুহাম্মদ মুনসুর উদ্‌–দৌলাহ্‌ পাহ্‌লোয়ান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

মূল্য ঃ ১৩.০০ টাকা মাত্র

CHOTADER MAHMUDA KHATUN SIDDQA (The Life-sketch of Mahmuda Khatun Siddiqa) : written by Maqbula Manzur for the children in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. June 1993

Price : Tk 13·00 ; US $: 1·00

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

শিশু-কিশোরদের কচি-কাঁচা মন-মস্তিষ্কে যা কিছুই প্রতিবিম্বিত হয় তাতে তারা প্রভাবিত হয়ে থাকে বড় হবার পরেও। কিশোর বয়সে গল্প ও ছড়া যেমন তাদের অন্তরে রেখাপাত করে তার চাইতেও অধিক তারা অনুপ্রাণিত হয় প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের জীবন-কাহিনী পড়ে। উপদেশের চাইতে দৃষ্টান্তের মূল্য বেশি। তাই কবি ও সমাজসেবিকা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার জীবনী গ্রন্থ আমাদের কন্যা-সন্তানদের জীবন পথে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে।

লেখিকা মকবুলা মনজুর বিরচিত 'ছোটদের মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা' শীর্ষক পুস্তিকাটি আমাদের কিশোরীদের জন্যে একটি সার্থক উপহার। পুস্তিকাটি তাদের চলার পথে কিঞ্চিৎ প্রেরণা যোগাতে পারলেও আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

এম. আতাউর রহমান

facebook/@maktabatuttalamij

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসিনী মা
মাহমুদা খাতুনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

facebook/@maktabatuttalamij

এক

গ্রামের নাম নিয়ামতপুর। কুষ্টিয়া জেলার ছোট্ট একটি সবুজ গাঁ। সেই গাঁয়ের খানদানী পরিবারের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর মোহাম্মদ সুলায়মান। ১৯০৬ সালের পৌষের এক শিশির-ভেজা দিনে তাঁর ঘরে জন্ম নিল ছোট্ট একটি মেয়ে। সেদিন কি কেউ জানতো ঐ টুকটুকে ফুলের মতো ছোট্ট তুলতুলে মেয়েটি বড় হয়ে একদিন বাংলা সাহিত্যের একজন নাম করা কবি হবে?

কবি কাকে বলে তাতো তোমরা জানোই। যাঁরা কবিতা লেখেন অর্থাৎ যাঁরা সুন্দর সুন্দর ভাষা আর ছন্দ দিয়ে তোমার-আমার সকলের মনের ইচ্ছাগুলোকে সাজিয়ে তোলেন, তাঁরাই হলেন কবি। এই দুনিয়ার চাঁদ, তারা, ফুল, পাখি, মেঘ, বৃষ্টি, নদী, ঝরনা সবকিছুকে তাঁরা ভাষা আর ছন্দ দিয়ে কবিতার মালা করে গাঁথেন।

পিতামাতা আদর করে মেয়েটির নাম রাখলেন 'বাতাসী'। বাতাসের মতো ফুরফুরে আর মিষ্টি যে মেয়ে তাকে তো বাতাসী নামেই মানায়, তাই না? কিন্তু 'বাতাসী' তো হলো ডাক নাম। পিতামাতা, নানা-নানীর আদরের নাম। সবার মুখে মুখে আদর হয়ে ঝরবে যে নাম সেই নাম হলো বাতাসী। কিন্তু ভালো নাম তো একটা চাই! তা সে নামও রাখা হলো। আকীকার নাম। আরবী নাম। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা। বড় হয়ে বাতাসী নামের মেয়েটির যখন কবি হিসেবে সুনাম ছড়ালো, তখন তিনি বিখ্যাত হলেন মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা নামেই।

facebook/@maktabatuttalamij

বাতাসীর আব্বা সুলায়মান সাহেব কর্ম জীবনে ছিলেন 'ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর'। বড় উদার মনের মানুষ। মা সৈয়দা রাহাতুন্নেসা খাতুন সে যুগে ভালো লেখাপড়া শিখেছিলেন। শুধু কি তাই! তাঁর যে নানী তিনিও ছিলেন রীতিমত শিক্ষিতা। কম করে হলেও পাঁচ–পাঁচটা ভাষা জানতেন তিনি। উর্দু, আরবী, ফারসী, নাগরী আর বাংলা। এই পাঁচটা ভাষা তিনি লিখতে, পড়তে ও বলতে পারতেন। একি সোজা কথা! তার উপর তিনি আবার ধর্মভীরু মহিলা। দুবার হজ্জ করেছিলেন।

দুই

বাতাসীর আব্বা সুলায়মান সাহেবের আদি বাড়ি ছিলো কুষ্টিয়া জেলায়। কিন্তু বাতাসী যখন খুব ছোট, তখনই তিনি সপরিবারে পাবনায় চলে আসেন।

সেই সময়ের একটা ছোট্ট ঘটনা। ঘটনাটি একটু ভয়েরই! পাবনায় সেবার ভীষণ মহামারী লেগেছে। মহামারী মানে জানো তো? মহামারী মানে এমন একটা রোগ, যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই শত শত মানুষ আক্রান্ত হয় আর মারা যায়।

কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি হচ্ছে এই ধরনের রোগ। আজকাল অবশ্য এসব রোগের উন্নতমানের ভালো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে। যদি এসবের কোন একটা রোগ কারুর হয়, তবে সাথে সাথে চিকিৎসা করে তাকে ভালো করা যায়। তাছাড়া কেউ যাতে এ ধরনের অসুখে আক্রান্ত না হয় সেজন্যে আগে থেকেই টিকা, ইঞ্জেকশন দেবার ব্যবস্থাও করা যায়। একে বলে

facebook/@maktabatuttalamij

প্রতিষেধক ব্যবস্থা। যার জন্যে আজকাল আর আমাদের দেশে খুব একটা মহামারী দেখা যায় না।

পাবনায় তখন ভীষণ মহামারী লেগেছে! ঘরে ঘরে লোক মরছে। যে এলাকায় মহামারী লেগেছে, সে এলাকা ছেড়ে মানুষ পালিয়ে অন্য এলাকায় চলে যাচ্ছে। সেখানে গিয়েও নিস্তার নেই, আক্রান্ত হচ্ছেই। এভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ছিলো।

বাতাসীর আব্বা অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন, যতদিন না এ বিপদ কাটছে, ততদিন পর্যন্ত সপরিবারে তিনি নদীর বুকে নৌকায় বাস করবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বিরাট এক বজরা নৌকা ভাড়া করে সবাইকে নিয়ে তিনি পদ্মায় ভাসলেন। ভেসে গেলেন লোক বসতির অনেক দূরে। যেখানে রোগের কোন জীবাণু নেই। আছে শুধু মুক্ত বাতাস আর খোলা আকাশ।

এ সময় ঘটলো আর এক ঘটনা। ছোট্ট কচি মেয়ে বাতাসী কিছুতেই নৌকার ছইয়ের ভেতর আটকে থাকতে চায় না। তাই বাড়ির পুরোনো কাজের লোক তাকে কোলে করে নৌকার খোলা জায়গায় নিয়ে খেলতে থাকে।

এ রকম খেলতে খেলতে একদিন কাজের লোকটা বাতাসীকে নিয়ে ঝুপ করে নদীর মধ্যে পড়ে গেল। কচি কণ্ঠের আর্তচিৎকার। সাথে সাথে মাঝি-মাল্লারা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নৌকার ভেতর থেকে কান্নায় অধীর হয়ে মা পর্দার কথা ভুলে ছুটে বেরিয়ে এলেন। আব্বা আর্তনাদ করতে লাগলেন। ততক্ষণে কাজের লোকটাই বাতাসীকে উদ্ধার করে তুলে ফেলেছে নৌকায়।

facebook/@maktabatuttalamij

বাবা দু'হাতে বুকে চেপে ধরলেন আদরের মেয়েকে। মা তাকিয়ে রইলেন ছলছলে চোখে। রাক্ষুসী নদী মেয়েকে গিলতে পারেনি।

তিন

চাঁদের কলার মতো দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলো ছোট্ট সেই মেয়ে বাতাসী। তাঁরা ছিল ছয় বোন এক ভাই। বাতাসী মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান। বাবার ছিল বদলীযোগ্য চাকরি। বাতাসী যখন বেশ ছোট, তখন চাকরি সূত্রে তাঁর আব্বার সাথে এলো বরিশালে। এখানেই বাতাসীকে প্রথম স্কুলে ভর্তি করা হলো। বরিশাল মিশনারী স্কুলে পড়তে গিয়ে প্রথম প্রথম মেয়ের সে-কি কান্না! স্কুলের শিক্ষিকারা ফুটফুটে মেয়েটিকে কত আদরে ভোলাতে চাইলেন! নানা রকম রঙিন খেলনা আর লাল-নীল বল দিয়ে খেলতে দিলেন। আর ঐ খেলনা দিয়েই চললো তাকে পড়া শেখানো। বল দিয়ে শেখানো শুরু হলো অংক করা, সংখ্যা গোনা। বুদ্ধিমতী মেয়েটি কান্না ভুলে গেলো। ঝুঁকে পড়লো এই পড়া-পড়া খেলার দিকে।

কিছুদিন পর সুলায়মান সাহেব বদলী হলেন জলপাইগুড়িতে। সেখানকার স্কুলেও ভর্তি করা হলো বাতাসীকে। তারপর আবার বাবার বদলীসূত্রে আসতে হলো রাজশাহীতে। এবারও রাজশাহী মিশন স্কুলে ভর্তি হলো বাতাসী। কিন্তু এর মধ্যে সুলায়মান সাহেবের সংসারে নেমে এলো এক দুঃখের ছায়া।

facebook/@maktabatuttalamij

বাতাসীর মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমন কঠিন অসুখ যে, কোন চিকিৎসাতেই ভালো হন না। শেষে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন হাওয়া বদলের। নদীকে ভালোবাসতেন বাতাসীর মা রাহাতুন্নেসা খাতুন। তাঁর ইচ্ছায় বিশাল এক বজরা নৌকা ভাড়া করে সপরিবারে পদ্মার বুকে ভেসে পড়লেন সুলায়মান সাহেব। দু'পাশের সবুজ গ্রাম। সবুজ শস্য ক্ষেত। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে যায়।

সাত বছরের মেয়ে বাতাসী নদীর পানি, হীরার টুকরোর মতো ঢেউ, নদীর বুকে চাঁদের ছায়া, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের শোভা দেখে ঐ অত অল্প বয়সেও মুগ্ধ হয়ে যেতো। অবাক দু'চোখের দৃষ্টি মেলে আল্লাহ্র দান এই সুন্দর প্রকৃতির রূপ দেখতো প্রাণভরে।

হাওয়া বদল করেও সুস্থ হলেন না রাহাতুন্নেসা। কিছুদিন পর তিনি স্বামী-সন্তানদের মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে গেলেন। মাতৃহারা হলো আট বছরের মেয়ে 'বাতাসী'। মাকে হারালো বটে, কিন্তু বাবার স্নেহ যেন আরও গভীর হলো তার ওপর। সুলায়মান সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন এ মেয়ে তাঁর আর সব ছেলেমেয়েদের চাইতে আলাদা। তিনি নিজেই বাতাসীর পড়াশোনার যত্ন নিতে শুরু করলেন। অনেক মজার মজার বই এনে দিলেন। শোনাতেন দেশ-বিদেশের গল্প-কাহিনী।

চার

মিশন স্কুলে যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে বাতাসী, তখন সুলায়মান সাহেব মেয়েকে একজন মুসলমান মহিলার লেখা কবিতা দেখিয়ে বলেছিলেন-'তুমি

facebook/@maktabatuttalamij

এমন লিখতে পারবে?’ কবিতাটি পড়ে বাতাসীর মনে কবিতা লেখার একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠলো। সবাইকে লুকিয়ে সে একটি কবিতা লিখে তার আব্বাকে দেখালো। আব্বা তো সে কবিতা পড়ে অবাক। সে কবিতা ছাপা হলো। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘আল–ইসলাম’ পত্রিকায় প্রথম যেদিন কবিতাটি ছাপা হলো সেদিন কী যে আনন্দ তাঁর! এরপর লিখলো সে আর একটি কবিতা। সেটি ছাপা হলো ‘সহচর’ নামের একটি পত্রিকায়। কবিতা লেখা চলতে থাকলো। সেই সাথে চলতে থাকলো পড়াশোনাও।

বাড়িতে তাদের যে পরিবেশ ছিল, তা যেমন শিক্ষিত, তেমনি ধর্মীয় ভাবে ভরা। বাতাসী যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, তখনই কবিতা লিখে লিখে সে একটি খাতা পুরো ভরে ফেলেছে। সে খাতার নাম দিয়েছে ‘ইস্‌লাম জ্যোতি’। সবচেয়ে বড় কথা, সে কবিতার খাতাটি উৎসর্গ করেছে তার প্রিয় নানাজানকে। অল্প বয়সেই ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য তার মনকে মুগ্ধ করেছিলো।

ইতিমধ্যে মাহমুদা খাতুনের বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মাতৃহারা ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার কিছুটা দায়িত্ব এসে পড়লো তার ওপর। তাদের স্নেহময়ী নানীও এসে থাকতেন তাদের সংগে। মাহমুদা খাতুনের তখন লেখাপড়া শেখার সময়। তার ওপর স্বভাবে সে বড্ড চঞ্চল। এই দেখা যাচ্ছে সে পড়ছে অথবা লিখছে, তারপরই উধাও। ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে বনে। তার সই শাহজাদীর সংগে আম বাগানে ঘুরে ঘুরে কাঁচা আম খাচ্ছে, বেতঝোপে ঢুকে বেথুল তুলে ভরে ফেলেছে আঁচল। কখনো বা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোলপাড় করছে পুকুরের

facebook/@maktabatuttalamij

পানি। এসব দুরন্তপনার জন্যে নানী আর খালারা কখনো কখনো বকতেন। নিষেধ করতেন বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে। পুকুর-দীঘিতে ঝাঁপাঝাঁপি করতে।

দুষ্টু মেয়ের মন ঐ শাসন মানতো না। নিঝুম দুপুরে যখন নানী-খালারা ঘুমিয়ে থাকতেন, চুপচাপ হয়ে যেতো সারা বাড়ি, তাকে তখন যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতো বনের গাছপালা, পুকুরের অতল কালো পানির ঢেউ। দুরন্ত মেয়েটি চুপিচুপি ঘুমিয়ে থাকা নানী আর খালাদের চুলে চুল বেঁধে ঘরের শেকল তুলে দিয়ে ভোঁ দৌড়—সইয়ের বাড়ি। ঘুম ভেঙে নানী আর খালাদের সে কি চেঁচামেচি। ততক্ষণ দুই সই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুকুরে অথবা ঘুরে বেড়াচ্ছে বন-বাদাড়ে। বনের পাখির মত মিষ্টি সুরে গান গাইতো মাহমুদা। বুনো ফুলের সুবাসে ভরে যেতো তাদের মন। গাছের ডালে বসে কোকিল ডাকতো, হলদে পাখি লেজ তুলে শিস্ দিতো, মাহমুদা সব চপলতা ভুলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতো এসব প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে। তার মনের ভেতরে যেন সাতরঙা আলো ঝিলমিল করতে থাকে।

পাঁচ

যত চপলতাই করুক না কেন, মাহমুদার লেখাপড়া আর কবিতা লেখা কিন্তু থেমে রইল না। রাজশাহী মিশন স্কুলের সে সকলের প্রিয় ছাত্রী। পরীক্ষার ফল

facebook/@maktabatuttalamij

দেখে আব্বা খুশি হন, শিক্ষকরা প্রশংসা করেন। বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মাহমুদা তার সমবয়সী মেয়েদের সংগে স্কুলে যায়। মিশনারী স্কুলে শেখা ভক্তিমূলক গান গায় সবাই গলা মিলিয়ে। সবার গলা ছাপিয়ে বাঁশীর মতো বেজে ওঠে মাহমুদার গলার মিষ্টি সুর। সন্ধ্যাবেলা মাগরিবের নামাযের পর ধীরে ধীরে যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন মাহমুদার মন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভক্তির ভারে নুয়ে পড়তে চায়। ছোট ভাই-বোনদের সাথে করে মাহমুদা ভক্তিমূলক গান গেয়ে চলে একের পর এক।

এ সময়ে একটা চিন্তা মাহমুদার মনকে আলোড়িত করতো। তার সব সময় মনে হতো তার জান্নাতবাসী মায়ের কথা। তার কেমন যেন বিশ্বাস হতো, মা তাদের কাছ থেকে বেশি দূরে যাননি। মনে হতো যখন রাত নিঝুম হয়ে আসে তখন অন্তর থেকে ডাকলে মা নিশ্চয় এসে তাদের দেখা দেবেন। প্রায়ই রাতের বেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো কমিয়ে দিয়ে ভাই-বোনেরা এক সংগে মিলে চোখ বুঁজে একমনে মাকে ডাকতো। সব বৃথা। মা আসতেন না। পরে একদিন এসব কথা জানতে পেরে নানী তাকে বুঝিয়ে দিলেন-যে আল্লাহ্‌র কাছে চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। কখনো না।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যেতো মাহমুদার। বকুল ফুল কুড়ানো ছিল তার নেশা। বাদল-ভেজা ঘাসের ওপর ছড়ানো বকুল ফুলগুলো দেখে তাঁর মনে হতো আল্লাহ্‌র তা'আলা যেন ঘাসের পাতায় ফুলের অক্ষরে কবিতা লিখে রেখেছেন। আল্লাহ্ দান মনে করতো ফুলগুলোকে। মালা গাঁথতো সে খোশবু ভরা বকুল ফুল দিয়ে। আর সেই সংগে গুনগুন করে গাইতো গান ঃ

facebook/@maktabatuttalamij

ভোরের বেলা কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।।

ছয়

মিশনারী স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে মাহমুদা ভর্তি হলো পাবনা লেডি কারমাইকেল স্কুলে। স্কুলে সবাই তার গুণে মুগ্ধ। সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও এই স্কুল থেকে সে সুন্দর রান্না, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পরিচ্ছন্নতার জন্যে 'ডিপ্লোমা' পেয়েছিল। কিন্তু তখনকার দিনের পর্দা প্রথার কড়াকড়ির জন্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তা হলে কি হবে! তার উদার হৃদয় আব্বা বাড়িতেই এক মেমের কাছে তার ইংরেজি পড়া, সেলাই শেখা আর ছবি আঁকা শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। ছবি আঁকায় হাত ছিল মাহমুদার খুব পাকা। এই সময়ে গদ্য রচনা লেখার জন্যে একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন মাহমুদা। এটি পাবনায় 'বেগম বাহার' নামে কোন একটা শিল্প সংস্থার আয়োজিত সাহিত্য পুরস্কার। এই একই সময়ে আবার পাবনাতে স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায়ও পুরস্কার পেয়েছিল।

পাবনাতে তার গৃহশিক্ষক ছিলেন সাহিত্যিক নজিবর রহমান। 'সাহিত্য রত্ন' ছিলো যাঁর উপাধি। নজিবর রহমান সাহিত্য রত্নের নাম তোমরা হয়তো অনেকেই জানো। ইনি ছিলেন সে যুগের একজন নামকরা মুসলমান সাহিত্যিক। তোমরা যখন বড় হয়ে এঁর লেখা 'আনোয়ারা' উপন্যাসটি পড়বে তখন বুঝতে

facebook/@maktabatuttalamij

পারবে ইনি কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, আর সে যুগের মুসলমান সমাজের কথাও অনেক জানতে পারবে। এই প্রতিভাবান সাহিত্যিক মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার শুধু গৃহশিক্ষকই ছিলেন না, তার কবিতা লেখা এবং সাহিত্য রচনারও উৎসাহদাতা ছিলেন তিনি। মাহমুদাকে তিনি আপন মেয়ের মতোই স্নেহ করতেন। মাহমুদাকে আদর করে তিনি 'খুকু' বলে ডাকতেন। খুব ভোরে তাঁর ঐ 'খুকু খুকু' ডাক শুনে মাহমুদার ঘুম ভেঙে যেত। মাহমুদার লেখা কবিতা আর গল্পের তিনি ছন্দ ঠিক করে দিতেন। ভুল শুধরে দিতেন। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র প্রতি অসীম ভক্তির আবেগ নিয়ে মাহমুদা যেসব কবিতা লিখতো সেই কবিতাগুলোর জন্যে মাহমুদাকে তিনি প্রাণভরে প্রশংসা করতেন এবং আরও বেশি করে লেখার জন্যে উৎসাহ দিতেন।

মাহমুদার কবি জীবনের আরো একটি সুন্দর প্রেরণা ছিল। সেটি হচ্ছে তার নানীর মুখে শোনা রূপকথার গল্প। জিন-পরী আর দৈত্যদানবের সব আজব কিস্‌সা-কাহিনী। এসব গল্প কাহিনী তার মনকে কল্পনার পঙখীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে রূপকথার রাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে যেতো। কল্পনার রঙিন পাখা মেলে তার কবিমন আরো কোথায় কতদূরে চলে যেতো কে জানে!

মাহমুদার ছিলো বই পড়ার ভীষণ নেশা। তার সুশিক্ষিতা মা রাহাতুন্নেসার ছিলো বই সংগ্রহ করার শখ। মায়ের রেখে যাওয়া বিশাল বাক্স ভর্তি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতো মাহমুদা। আর সেই বইয়ের বেশির ভাগই ছিল মুসলিম মহাপুরুষ, নবী, পীর, মুর্শিদ, দরবেশ আর অলি-আউলিয়াদের জীবন কাহিনী।

facebook/@maktabatuttalamij

তাঁদের মাহাত্ম্যের কথা, তাঁদের জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনা পড়ে তার মনে ধর্মভাব আরও গভীর হতে থাকে।

সাত

বেশ কিছুকাল কেটে গেল। সেদিনের সেই দুরন্ত বালিকা বাতাসী এখন বড় হয়েছেন। শান্ত, নম্র আর সংযত হয়েছেন। মাত্র আট বছর বয়সে যে তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করেছেন তাও এগিয়ে চলেছে সমান গতিতে। ছোট ছোট ভাইবোনের যত্ন করা, তাঁর স্নেহময় আব্বার খিদমত করাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বলে মনে করেন তিনি।

মেয়ে বড় হয়েছে। এখন তাঁর নিজের ঘর–সংসার করার সময়। সুলায়মান সাহেব সে রকম ব্যবস্থাই করতে চাইলেন। কিন্তু মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার ইচ্ছা অন্যরকম। তিনি চান কবিতা লিখে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নিজের সমস্ত ভক্তি ভালোবাসা নিবেদন করে জীবন কাটাতে। সুলায়মান সাহেব মেয়ের ইচ্ছায় বাধা দিলেন না। কারণ প্রথম থেকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর এই মেয়ে ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়।

ইতিমধ্যে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার নাম কবি হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে। কোলকাতার অনেক পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হচ্ছে। স্নেহময় পিতা দেখেন তাঁর শান্ত–সুশ্রী মেয়েটি নির্জন দুপুরে আপন মনে পায়চারী করে আর মুখে মুখে কবিতার ছন্দ মিলায়। আবার খানিকক্ষণ পরপর পড়ার টেবিলে বসে সেই কবিতা লিখতে শুরু করে। আবার তাঁর চোখে পড়ে কোন কোন দিন গভীর রাত

facebook/@maktabatuttalamij

পর্যন্ত মেয়ে জায়নামাযে তন্ময় হয়ে বসে আছে আল্লাহ্‌র ধ্যানে। পীর–মুর্শিদের জীবনী হাতে এলে নাওয়া–খাওয়া ভুলে তারই মধ্যে ডুবে যায়। এই দেখে সুলায়মান সাহেব মেয়েকে নিয়ে কোলকাতায় এলেন। শুধু শহর দেখাতেই নয়। কোলকাতার তালতলায় ছিল সুলায়মান সাহেবের পরম শ্রদ্ধেয় পীর হুজুর পাকের খানকা শরীফ। পীর সাহেব পরম সমাদরে ভক্তিমতী মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে নিজের মুরীদ করে নিলেন।

এক নতুন আনন্দ বুকে নিয়ে মাহমুদা খাতুন কোলকাতা থেকে পাবনায় ফিরে এলেন। এই সময় তাঁরা স্থায়িভাবে পাবনাতেই বসবাস করছিলেন। প্রায় প্রত্যেক বছরই মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা পীর সাহেবের সংগে দেখা করার জন্যে কোলকাতায় আসতেন। সেই সময় কোলকাতার কবি–সাহিত্যিকদের সংগেও তিনি দেখা–সাক্ষাত করতেন।

এই সময় থেকেই বাংলার অনেক প্রতিভাবান হিন্দু এবং মুসলমান কবি–সাহিত্যিকের সংগে তাঁর পরিচয় হতে শুরু করে। তিনি কবি রবীন্দ্রনাথেরও স্নেহ লাভ করেছিলেন।

এছাড়া বাংলার বুলবুল কবি নজরুল ইসলাম আর লোকগীতি সম্রাট আব্বাস উদ্দীনেরও স্নেহ–মমতা লাভ করেছিলেন মাহমুদা।

আট

কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে পাবনাতে। পাবনায় তখন একটা সুন্দর সাহিত্যের পরিবেশ ছিল। কোলকাতা

facebook/@maktabatuttalamij

থেকে নাম করা কবি-সাহিত্যিকরা প্রায়ই তখন পাবনায় আসতেন। সাহিত্য সভা হতো। কবিতা পাঠের আসর বসতো। তাতে মাহমুদা খাতুনও অংশ নিতেন। পাবনার শীতলাই জমিদার বাড়িতে একবার একটা বিরাট সাহিত্য সম্মেলন হয়। সেখানে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় মাহমুদা খাতুন প্রথম পুরস্কার পান।

১৯৩৬ সালের কথা। পাবনার বনমালী ইন্সটিটিউটে বিরাট এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে সভানেত্রীর সম্মান দেয়া হলো মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে। আজকের দিনে তোমরা ভাবতেও পারবে না সেই কড়া পর্দার যুগে কতখানি প্রতিভা, শিক্ষা আর যোগ্যতা থাকলে একজন মুসলমান মহিলা সাহিত্য সভার সভানেত্রী হবার সম্মান পেতে পারেন।

১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'পসারিণী' বের হলো। তখন সারা বাংলাদেশে এই কবির নাম, তাঁর কবিতার নাম শোনা যেতে লাগলো।

কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার আরো একটা গুণের কথা বলি। এটা অনেক বড় গুণ। তিনি ছিলেন সমাজ সেবিকা। মানুষকে নিয়েই সমাজ আর সমাজের সেবা করা মানেই মানুষের সেবা করা। সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি তখনই সন্তুষ্ট হন যখন আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে রোগে, শোকে, দুঃখে, ব্যাধিতে খিদমত করি।

মাহমুদা খাতুন মানুষের খিদমত করতেন, কিন্তু সেজন্যে কোন প্রশংসা চাইতেন না তিনি। তিনি কোন সমিতি বা দল নিয়ে সমাজসেবা করা পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন

facebook/@maktabatuttalamij

কারোর কোন বিপদ হলে তিনি সাহায্য করার জন্যে ছুটে যেতেন। রোগে-শোকে খিদমত করতেন। সান্ত্বনা দিতেন।

ছোটবেলা থেকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। পাড়ার গরীব মহিলা আর শিশুদের তিনি চিকিৎসা করতেন, আবার বিনা পয়সায় ওষুধও দিতেন। মাত্র পনেরো-ষোল বছর বয়সেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর বেশ হাতযশ হয়েছিল। এজন্যে আবার তিনি রীতিমত পড়াশোনাও করতেন।

প্রতিদিন বিকেলবেলা তাঁর বাড়িতে ডাক্তারখানা বসতো। ছোট বোন দু'টো উঠানে টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে দিতো। টেবিলের উপর থাকতো হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স আর হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মোটা বইখানা। বিকেল হতেই রোগীরা আসা শুরু করতো। রোগীতো নয় সব রোগিণী। আর ছোট ছোট শিশুর দল। ছোট বোনেরা সবাইকে যত্ন করে বসাতো।

মাহমুদা প্রথমে মহাপ্রাণ হ্যানিম্যানের উদ্দেশে মনের শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর দোয়া চাইতেন। তারপর রোগীদের সংগে কথা বলতেন। কে কেমন আছে, ওষুধে কোন উপকার হয়েছে কি না-এ সব কথা। নতুন কোন রোগী এলে তার অসুখ সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। তারপর ভালো করে বই দেখে লক্ষণ মিলিয়ে তবে ওষুধ দিতেন। তাঁর মিষ্টি ব্যবহারের গুণে রোগীদের অর্ধেক অসুখই যেন সেরে যেতো। তার উপর ছিল ওষুধেরও গুণ। আর শুধু কি ওষুধ! গরীব রোগীদের তিনি নিজের ঘর থেকে সাবু, বার্লি, চিনি, মিছরি ইত্যাদি পথ্য

facebook/@maktabatuttalamij

দিয়ে পর্যন্ত সাহায্য করতেন। মানুষের মুখে হাসি ফোটানোতে ছিল তাঁর আনন্দ। শুধু পাবনাতেই নয়, তার আব্বা যখন যেখানে বদলী হয়েছেন সেখানেই তিনি মানুষের উপকার করার কাজে এগিয়ে গেছেন। ধনীর দুলালী এবং অভিজাত ঘরের মেয়ে হয়েও তিনি গরীব ঘরের মেয়ে-বউদের আপন করে নিতেন, কাছে টেনে নিতেন পরম মমতায়। তাদের বিপদে-আপদে সব রকমের সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন।

নয়

শিক্ষা এবং জ্ঞানের আলোয় মাহমুদা খাতুনের মন ছিলো প্রদীপ শিখার মত উজ্জ্বল। এই জ্ঞানের আলো শুধু নিজের ভেতরে রেখেই তিনি সুখী হতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন এ দেশের অশিক্ষিত মুসলমান মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে। নিজের বাড়িতে স্কুল খুলে আশপাশের যত গরীব অশিক্ষিত মহিলা আর শিশু ছিল সবাইকে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাড়িতে যেসব কাজের লোক ছিলো তাদেরও অক্ষর শিক্ষাদান করার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিলো না। এই যে আজকাল আমাদের দেশে 'নিরক্ষরতা দূরীকরণের' চেষ্টা চলছে, সবাইকে বলা হচ্ছে নিরক্ষরকে অক্ষর পরিচয় করাতে, বিদ্যাহীনকে বিদ্যা দান করতে, এই মহান ব্রত মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে কেউ আদেশ করেননি, কেউ অনুরোধও করেননি; তিনি নিজেই এ পবিত্র দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।

facebook/@maktabatuttalamij

তাঁর বাড়িতে গড়া স্কুলের ছাত্রীদের জন্যে তিনি নিজের হাতে নানা উপদেশপূর্ণ একখানা বই লিখেছিলেন। বইখানার নাম দিয়েছিলেন 'জ্ঞানালোক'। এই বই অবশ্য ছাপা হয়নি। হাতের লেখা বইটি থেকেই তিনি তাদের নানা উপদেশমূলক কথা শেখাতেন। সেই বইয়ের কিছু অংশ তুলে ধরছি ঃ

"আমার প্রিয়তমা বালিকাগণ, তোমরা জান জ্ঞানের আলোক কে? যিনি এই সমগ্র পৃথিবী, নদনদী, বৃক্ষ, ফল, ফুল ও তনুহীন সুশীতল বায়ুর স্রষ্টা তিনিই জ্ঞানের আলোক। যাঁর কৃপায় আমরা দীর্ঘ জীবন ধারণপূর্বক প্রাকৃতিক, সাংসারিক নানা প্রকার সুখ অনুভব করি, যাঁহাকে আমরা ভক্তিময় ভাষায় উপাসনা করিয়া থাকি তিনিই জ্ঞানের আলোক। তাঁর পবিত্র আদেশ বাণীই আমাদের পুণ্য পথের প্রদর্শক। আমাদের একান্ত কর্তব্য সহস্র কাজের মধ্যেও তাঁহাকে না ভুলা ও একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপাসনা করা।"

তাঁর লেখা এই উপদেশ থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমাদের তিনি কত যত্ন করে, কত সুন্দরভাবে শিক্ষা দান করতেন। তাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি, ধর্মের প্রতি ভক্তি জাগিয়ে তোলার জন্যে তিনি লিখেছিলেন, "প্রথমে খোদা, পরে ধর্ম। ধর্ম পাইলে খোদাকে পাওয়া যায়, খোদাকে পাইলে ধর্ম পাওয়া যায়। ইহারা পাশাপাশি অবস্থান করে। ধর্ম খোদার করুণা লাভের একমাত্র উপায়। স্বর্গদ্বার খোলার একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার প্রভা শত শত সূর্য অপেক্ষা সহস্রগুণ তেজস্কর। কি সে জিনিস এমন, তাহাকে আমরা চিনিয়াও চিনি না; কারণ আমরা

facebook/@maktabatuttalamij

অন্ধ। কাঁচকে বলি হীরা। নচেৎ এমন অমূল্য বস্তু পবিত্রতার আধারকে হৃদয়ে রাখি না কেন? আমাদের উচিত চেষ্টার পর চেষ্টায় জ্ঞানচক্ষু উম্মিলন করা এবং সহস্র কর্মের মধ্যেও সেই বিশ্বপ্রভুর চরণে নত থাকা। আমিন।"

আগেই বলেছি 'জ্ঞানালোক' নামের এই বইটির কোন ছাপানো বই নেই। মাহমুদা তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় নিজের হাতে গড়া স্কুলটির ছাত্রীদের জন্যে বইটি লিখেছিলেন। হাতে লেখা এই বই থেকেই তাদের সুন্দর সুন্দর সব উপদেশের কথা শেখাতেন। কিভাবে জীবনকে সুন্দর করতে হয়, গড়ে তুলতে হয়।

দশ

মাহমুদা ছিলেন সকলের প্রিয়। সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন। তিনিও সবাইকে ভালোবাসতেন। হয়তো কোন ছাত্র টাকার অভাবে পরীক্ষার ফি দিতে পারছে না; তাঁর কানে এ কথা এলে যেভাবেই হোক তার পরীক্ষার 'ফির' টাকা জোগাড় করে দিতেন। কত গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে যে তিনি বইপত্র কিনে দিতেন, নিয়মিত স্কুলের বেতনের টাকা দিতেন তার কোন হিসেব নেই।

দেশে বন্যা, ঝড়--এই ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে তিনি পাড়ার ছেলেদের ডেকে চাঁদা তুলতে উৎসাহ দিতেন। গান লিখে তাতে নিজে সুর দিয়ে তাদের শিখিয়ে দিতেন। তখন তারা মিছিল করে সেই গান গেয়ে দুর্গতদের সাহায্যে চাঁদা তুলে বেড়াতেন।

facebook/@maktabatuttalamij

মাহমুদা খাতুন প্রথম জীবনে নিজের 'মা'–হারা ভাইবোনদের মায়ের মতো স্নেহ–আদর দিয়ে মানুষ করেছেন। পরবর্তীকালে বোনদের ছেলে–মেয়েদের নিজ সন্তানতুল্য পরম আদরে বুকে আঁকড়ে রাখতেন। তাদেরই অনুরোধে পরে তিনি পাবনা থেকে ঢাকা চলে এলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরাই তাঁকে ঘিরে থেকেছে। তিনিও এদের সেই ছোট্ট বেলা থেকে সব রকম আবদার সহ্য করেছেন। মায়ের চেয়েও এদের দাবি–আবদারের জায়গা ছিল খালাম্মার কাছে অনেক বেশি। তাঁরও সব আনন্দ, সব সুখ ছিল ওদের আদর–যত্ন করে। ওদের ছোট বেলায় কোন কাজে যখন তিনি কোলকাতায় যেতেন অথবা পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে, ফেরার সময় ওদের জন্যে কত কি যে উপহার আনতেন! সুন্দর সুন্দর ছবির বই, মেম পুতুল, ডলি পুতুল, বল, জামা–কাপড় আরও কত কি! নিজের জন্যে কিছু আনতেন না। তাঁর তো ছিলো ওদের দিয়েই আনন্দ। ওদের মুখের হাসি, চোখের খুশি দেখেই তাঁর সুখ। তাঁর সেই আদুরে বোনপো বোনঝিরা বড় হয়েও চাইতো তাদের খালাম্মার কাছে কাছে থাকতে। কাজেই তাঁর ঢাকায় চলে না এসে আর উপায় কি! ঢাকায় এসে কিন্তু উনি আর শুধু ওদেরই খালাম্মা হয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁর মিষ্টি মায়াভরা ব্যবহারের গুণে অল্প বয়সী কবি–সাহিত্যিকদেরও 'খালাম্মা' হয়ে গেলেন। তারা সবাই তাঁর স্নেহের ধন হয়ে উঠলেন।

এগার

ঢাকায় আসবার কয়েক বছর পর তাঁর দু'খানা কবিতার বই বের হলো। সেগুলোর নাম–'মন ও মৃত্তিকা' এবং 'অরণ্যের সুর'।

facebook/@maktabatuttalamij

তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে 'রাঙা ঘুড়ি' আর 'রোদ বৃষ্টি' নামে দু'খানা কবিতার বই লিখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজো সেই বই দু'টো ছাপা হয়ে বেরোয়নি। আর সেজন্যে তোমরাও সেই মিষ্টি মিষ্টি কবিতাগুলো পড়তে পারোনি। যদি কখনও 'রাঙা ঘুড়ি' আর 'রোদ বৃষ্টি' ছাপা হয়ে বের হয়, তখন পড়তে ভুলো না যেন! এ ছাড়াও তিনি ছোটদের পত্রিকাগুলোতে তোমাদের জন্যে অনেক ছড়া আর কবিতা লিখেছেন।

তাঁর কবিতায় মানুষ আর দেশের প্রতি ভালোবাসা যে কত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, তা বড় হয়ে যখন তোমরা তাঁর কবিতা পড়বে তখন বুঝতে পারবে। তাঁর মন ছিল দেশের মাটির গন্ধে ভরপুর। আমাদের এই দেশের মাটি যখন লাখো শহীদের বুকের রক্তের বদলে স্বাধীন হলো তখন তিনি সেই বীর শহীদদের স্মরণ করে লিখলেন ঃ

একদা যে বুলেটের ঘায়ে
পড়েছিল লুটাইয়া ধরার ধূলায়
পথে পথে ছড়াইয়া সুরভি কুসুম
মৃত্যু তাঁর মৃত্যু নয়..........।

* * *

তাদের স্মরণ করি তাদের প্রেম
রাঙা এ নিশান

facebook/@maktabatuttalamij

উর্ধ্বে তুলে ধরি আজ
কহিব গর্বভরে
কহিব সমুচ্চ কণ্ঠে
এ দেশ আমার।

দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। বয়সের ভার আর অসুস্থতায় শরীরও অনেক ভেঙে গেছে। তবু স্বাধীনতার সূর্য যখন উদয় হলো তখন তাঁর মন আনন্দে তোমাদের মতোই আন্দোলিত হয়ে উঠলো। খুশির নেশায় মেতে তিনি লিখলেন ঃ,

নতুন মাটির পরে
সূর্য দিয়েছে আলো।
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার বর্ণ
ঝিকমিক করছে বালুগুলো,
কি সুন্দর নতুন মাটি,
কি সুন্দর তার গন্ধ
চেয়ে চেয়ে দেখছে আকাশ,
চেয়ে চেয়ে দেখছে সূর্য
নতুন মাটি, এ যে নতুন মাটি।

মানুষে মানুষে হানাহানি, রক্তপাত ইত্যাদি কবিকে বড় দুঃখ দিতো। তিনি যুদ্ধকে, হিংসাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন সবাই সবাইকে ভালোবাসুক। মানুষের ভালোবাসাতে এই দুনিয়া শান্তির বেহেশত হয়ে উঠুক।

facebook/@maktabatuttalamij

পৃথিবীর যে যেখানে আছে সবাই সুখে থাক, শান্তিতে থাক—এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কামনা। শান্তির বাণীকে তিনি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় রহমত বলে মনে করতেন। তাই বলে যেন মনে করো না যে, শান্তির জন্যে তিনি অন্যায়কে মেনে নিতেন। অন্যায়ের প্রতি ছিলো তাঁর তীব্র ঘৃণা। তিনি চাইতেন মানুষ হোক সৎ, সরল আর শিশুর মত পবিত্র আনন্দে ভরা। আসলে তিনি নিজেই যে তা-ই ছিলেন।

বার

তিনি তো অনেক লিখেছেন। কবি হিসেবে অনেক সম্মান আর সুনামও লাভ করেছেন। কিন্তু তাতেই তিনি খুশি থাকতে পারেন নি। তিনি চাইতেন, যে সব মুসলমান মেয়ে গল্প, কবিতা লেখে তাদেরও লেখা ছাপা হোক, বই বের হোক। তাদেরও সুনাম হোক। তারাও যোগ্য মর্যাদা লাভ করুক। আর এ জন্যে নতুন লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পত্রিকা অফিসগুলোতে যেতেন, তাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন, তাদের লেখা ছাপানোর জন্যে অনুরোধ করতেন। এ রকম গুণ খুব কম লেখিকার মধ্যে পাওয়া যায়।

কেউ কোন ভালো কাজ করছে শুনলে তিনি কি যে খুশি হতেন! সে কাজ যে করেছে তাকে প্রশংসা করতেন, প্রাণভরে দোয়া করতেন। উৎসাহ দিতেন এমনি আরও ভালো কাজ, সৎকাজ করার জন্যে।

facebook/@maktabatuttalamij

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা নিঃসন্তান হয়েও তাঁর ভালোবাসার গুণে অনেকের কাছ থেকে তিনি মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তাঁর কবি প্রতিভার জন্যে তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়েছিল দেশের মানুষ।

১৯৬৬ সালে 'বেগম ক্লাব' তাঁকে সম্মান জানাবার জন্যে সুন্দর একটি উৎসবের আয়োজন করেছিল। কবি সেই উৎসবে এসে কত যে খুশি হয়েছিলেন আর কত সুন্দর সুন্দর সব কথা বলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তারপর ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী তাঁকে একাডেমী পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানালেন। আর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানিত 'একুশে পদক' দিয়ে সম্মান করলেন।

এই যে বড় বড় সম্মান তিনি পেলেন—এ সবতো তাঁর মতো মানুষেরই পাবার কথা। কিন্তু এগুলোকে তিনি বড় করে দেখতেন না। তাহলে বলতো তিনি বড় করে দেখতেন কোন্‌টাকে? সবাই যে তাঁকে ভালোবেসে 'খালাম্মা' বলে ডাকতো, 'আম্মা' আর 'মা-জী' বলে ডাকতো—সেই ভালোবাসাকেই তিনি দেখতেন সবচেয়ে বড় করে।

তের

আস্তে আস্তে কবির বয়স বাড়লো। স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করলো। এমনিতেই ছিলেন তিনি হালকা-পাতলা মানুষ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। মাঝে মাঝে যখন একটু সুস্থ থাকেন, হাসি মুখে উঠে বসেন। কষ্ট করে

facebook/@maktabatuttalamij

হলেও সাহিত্য অনুষ্ঠান আর আত্মীয়–বন্ধুদের বাসায় যান। কেউ বেড়াতে এলে সুস্থ মানুষের মতো ছুটোছুটি করে যত্ন–আত্তি করতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু হৃদরোগ এমন একটা অসুখ যা মানুষকে কিছুতেই সুস্থ থাকতে দেয় না। কবিকেও তাই বারবার বিছানা নিতে হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়েও চলে কবিতা লেখা, চলে গুনগুন করে গান গাওয়া। শুধু শান্ত চোখ মেলে জানালা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। দেখেন নীল আকাশে তুলার মত মেঘ ভেসে যায়, কখনও বর্ষার কালো মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামে। বাতাসে ভেসে আসে নতুন ফোটা কদম ফুলের গন্ধ। অসুস্থ কবির বুক সেই সুবাসের আনন্দে ভরে ওঠে। কদম ফুল যে তাঁর বড় প্রিয় ফুল! বর্ষা ঋতুতে যখনই কদম ফুল ফোটে তখন সেই কদম ফোটার খবরটি যদি কেউ তাঁকে দিতো বড় খুশি হতেন কবি। কদম ফুল ফোটার খবরটা ছিলো তাঁর কাছে সবচাইতে আনন্দের খবর।

এভাবে প্রায় দশটি বছর কেটে গেল। কখনও ভালো থাকেন আবার কখনও বিছানায় পড়েন। শেষ পর্যন্ত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হলো।

হাসপাতালের পরিবেশেও মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা সবার আপন হয়ে উঠলেন। যখন খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন ডাক্তার–নার্সরা ঘিরে ধরে তাঁর বিছানা, অক্সিজেন দেওয়া হয়। দেওয়া হয় ইঞ্জেকসন, ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয় ওষুধ দিয়ে। কিন্তু যেই একটু সুস্থ হন অমনি উঠে বসেন বিছানায়। আরো একটু সুস্থ হলে নেমে পড়েন বিছানা ছেড়ে। অন্য রোগীদের খোঁজখবর নেন,

facebook/@maktabatuttalamij

সাধ্যমত সেবা পর্যন্ত করেন। আর কিছুই যদি না পারেন তাহলে তাদের কাছে বসে সান্ত্বনার কথা বলেন, আশার কথা শোনান।

কেউ যদি হাসপাতালে তখন কবিকে দেখতে যেতো তাঁর বিছানায় খুঁজেই পেতো না তাঁকে। পাবে কি করে! তিনি তো তখন অন্য রোগীর কাছে বসে। আবার কখনও যদি খুব ক্লান্তি বোধ করতেন, তখন এসে বসতেন নিজের বিছানায়। তখনও তাঁর মুখে লেগে থাকতো মিষ্টি হাসি। পরনের সাদা শাড়িটির মতোই শুভ্র পবিত্র হাসিতে ভরা মুখে শুধাতেন, 'কেমন আছো?' তার মানে তাঁকে যে দেখতে গেছে সে কেমন আছে এটাই জানার জন্যে তিনি ব্যাকুল।

চৌদ্দ

শেষের দিকে যখন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখনও তিনি কথা-বার্তায় কত সজীব! কেউ তাঁকে দেখতে এলে মৃদুকণ্ঠে গুনগুন করে কত গল্প করতেন। সবই প্রায় তাঁর ছেলে বেলার গল্প। জীবনের শেষের দিনগুলোতে ছেলেবেলার সব কথা বুঝি তাঁর বেশি করে মনে পড়তো। সেই বকুল ফুল কুড়ানোর কথা, পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি, মুরুব্বিদের চোখ এড়িয়ে ভাই-বোনেরা মিলে চুপি চুপি যাত্রা দেখতে যাওয়া, গান শুনতে যাওয়া—শুধু এ সব কথা আর এ সব গল্প। ডাক্তারেরা তাঁকে কথা বলতে নিষেধ করতেন, বলতেন কথা বললে অসুখ বেড়ে যাবে। যারা তাঁকে দেখতে যেতো তারাও নিষেধ করতো কথা বলতে। কিন্তু সে কথা কি তিনি শোনেন! বলতেন-"বারে! তুমি আমাকে দেখতে এসেছ, আমার

facebook/@maktabatuttalamij

এতে কত আনন্দ! কথা না বললে সে আনন্দ আমি বোঝাব কি করে?" যদি অসুখ বেড়ে যাবার কথা বলা হতো তাহলে বলতেন—"অসুখ তো বাড়বেই, তাতে ভয় কি? আল্লাহ্ একদিন যেমন আদর করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন আবার তেমনি আদর করেই একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।"

তারপর একদিন সেই দিনটি এলো। ১৯৭৭ সালের ২রা মে, সোমবার রাত নয়টা পাঁচ মিনিটে এলো পরপারের ডাক। কবি চিরঘুমের দেশে, যেনো চির শান্তির দেশে চলে গেলেন। পেছনে পড়ে রইলো তাঁর সত্তর বছরের জীবনের হাসি-কান্না ভরা স্মৃতির পসরা।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার কবিতাগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে আছে জীবনের আনন্দের কথা। সেগুলো পড়লে আমরা পৃথিবীকে ভালোবাসতে শিখবো। মানুষকে ভালোবাসতে শিখবো।

ইফাবা—৯২-৯৩-প্র/৬১৪১ (উ)-৩২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij